বাংলাদেশে সুশাসনের ইস্যুসমূহ

ইউনিট ১০

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মূল লক্ষ্য মানব উন্নয়ন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও জাতিসংঘ প্রত্যেক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি জোর দিচ্ছে। একটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুশাসন। সুশাসন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনী কাঠামো ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে, যা দারিদ্র বিমোচন,পরিবেশ সুরক্ষা, লিঙ্গগত বৈষম্য রোধ করে। আলোচ্য ইউনিটে বাংলাদেশ ও সুশাসন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্নীতি রোধ, জলবায়ু পরিবর্তন ও রাজনীতি, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও করণীয়, খাদ্যে ভেজাল ও আমাদের করনীয়, পরিবেশ দূষণ ও সুশাসন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১: বাংলাদেশ ও সুশাসন
পাঠ-২: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)
পাঠ-৩: সুশাসনে নারীর ক্ষমতায়নের ভূমিকা
পাঠ-৪: দুর্নীতি: কারণ ও প্রতিকার
পাঠ-৫: জলবায়ু পরিবর্তন ও রাজনীতি
পাঠ-৬: বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও করণীয়
পাঠ-৭: খাদ্যে ভেজাল ও আমাদের করণীয়
পাঠ-৮: পরিবেশ দূষণ ও সুশাসন

পাঠ-১০.১ বাংলাদেশ ও সুশাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সুশাসন কাকে বলে জানতে পারবেন।
- সুশাসনের উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- সুশাসনের ইস্যুসমূহ সম্পর্কে জানতে করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অংশগ্রহণ, বিকেন্দ্রীকরণ, তথ্য অধিকার, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা।

সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ (Good Governance)। শাসন শব্দের সাথে সুপ্রত্যয়টি যুক্ত করা হয়েছে। সুশাসনকে একক কোনো ধারণা দিয়ে সংজ্ঞায়িত বা ব্যাখ্যা করা যায় না। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় 'সুশাসন' (Good Governance) প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়। সুশাসনের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রে একটি কল্যাণকর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। সুশাসনের মাধ্যমে নাগরিক সমাজের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

সুশাসন হল সরকারের এমন এক ব্যবস্থা যার লক্ষ্য রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজের মধ্যে বৈধ সম্পর্ক ও উন্মুক্ত যোগাযোগ নিশ্চিত করা। সেই সাথে কার্যকরি ও দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি, নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা এবং প্রতিনিধিত্বকারী দায়িত্বশীল সরকারি কাঠামোকে ক্রিয়াশীল করা।

অর্থাৎ, যেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুরক্ষা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত, বাক স্বাধীনতা থাকে, সেই শাসনকে সুশাসন বলা যায়।

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আর গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুশাসন। যে কোন রাষ্ট্রর অগ্রযাত্রার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে সুশাসন। সুশাসিত রাষ্ট্রই কেবলমাত্র কল্যাণ রাষ্ট্র হতে পারে।

সুশাসন কথাটি বিশ্বব্যাংকের উদ্ভাবিত ধারণা। একটি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বব্যাংক সর্বপ্রথম উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে সুশাসন ধারণাটিকে গুরুত্ব দিয়েছে। ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক সুশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় চারটি শর্ত ঘোষণা করে। সেগুলো হলো : ১. দায়িত্বশীলতা ২. স্বচ্ছতা ৩. আইনী কাঠামো ৪. অংশগ্রহণ

১। **দায়িত্বশীলতা :** প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিভাগের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে সঠিক সময়ে পালনই দায়িত্বশীলতা। বাংলাদেশে সরকারি কার্যালয়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে দায়িত্বশীলতার চরম ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়।

২। **স্বচ্ছতা :** সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্বচ্ছতা অপরিহার্য। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সেবা বন্টনের ক্ষেত্রে কখন কোথায় কিভাবে কতটুকু সম্পদ বা সেবা প্রদান করা হল তার তথ্য জানা প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার। স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে সরকার ও জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।

৩। **আইনী কাঠমো :** দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা আইনের শাসন এগুলো নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ ও দক্ষ আইনী কাঠামো প্রয়োজন। যেমন, কর্মস্থলে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ফলে পূর্বের চেয়ে অধিক স্বচ্ছতা এসেছে। এভাবে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও পুরনো আইন হালনাগাদ করে সুশাসন উপযোগী একটি আইনী কাঠামো গড়ে তোলা অপরিহার্য।

৪। **অংশগ্রহণ :** অংশগ্রহণ বলতে মূলত সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনগণের ভূমিকাকেই বোঝায়। এ জন্য অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রয়োজন। নির্বাচন, সভা-সমিতি, ইশতেহার, শোভাযাত্রা, সেমিনার এর মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা যায়।

বাংলাদেশ ও সুশাসন :

দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভ করে। পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৫ বছরের শাসনামলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানে সুশাসনের কোন চিহ্ন ছিল না, ছিল না মানবাধিকার, ছিল না সম্পদ বন্টনে সমতা আর আইনের শাসন। স্বাধীনতার পর শুরু হল দেশ গড়ার সংগ্রাম। দেশ গড়ার সংগ্রামে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুশাসনের অনুপস্থিতি। দেশি-বিদেশী চক্রান্ত আর অবৈধ ক্ষমতা দখলের পরিণতিতে সুশাসন ক্রমাগত বিলম্বিত হয়েছে।

বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অত্যন্ত জরুরি। শাসনকার্যে জনসম্পৃক্ততা যত বৃদ্ধি পাবে, সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও একইভাবে বৃদ্ধি পাবে। কারণ জনগনের মতামতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়ন হলে তা সুশাসনেরই নামান্তর। বাংলাদেশে সুশাসনের জন্য দরকার লিঙ্গভিত্তিক সমতা প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশ সরকার লিঙ্গ ভিত্তিক সমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুশাসনের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে তৃনমূল পর্যায়ে যতটা সম্প্রসারিত করা যাবে সুশাসন ততটাই জোরদার হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে এক্ষেত্রে নানা ধরণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশে সুশাসনের ইস্যুসমূহ :

বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য দাতা সংস্থা ও বিশেষজ্ঞগণ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অনেকগুলো পূর্বশর্ত বা উপাদানের অপরিহার্যতার কথা বলেছেন। বাংলাদেশ বর্তমানে সেগুলো পূরণে কাজ করে যাচ্ছে। সুশাসনের ইস্যু রাষ্ট্র ও সমাজভেদে আলাদা হতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এ ধরণের বিশেষ কয়েকটি ইস্যু রয়েছে। যেমন দুর্নীতি, পরিবেশ দূষণ, অপরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া খাদ্যে ভেজাল, নারী নির্যাতন, জলবায়ু পরিবর্তনের আঘাতে উপকূলীয় অঞ্চলসহ বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ এবং কৃষি জমির ক্ষতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার অভিযানে এ ইস্যুগুলো ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এসব ইস্যুগুলো অবশ্যই মোকাবেলা করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের সুশাসনের ইস্যুসমূহ সম্পর্কে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

সুশাসন প্রত্যয়টির ইংরেজি প্রতিশব্দ `Good Governance'। সুশাসনের কতকগুলি উপাদান রয়েছে। সেই উপাদানগুলির উপস্থিতি নিশ্চিত হলে একটি রাষ্ট্র সুশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। একটি সুশাসিত রাষ্ট্রই পারে নাগরিকদের সর্বাঙ্গিন মঙ্গল ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সুশাসন প্রত্যয়টি প্রথম প্রচলন করে-

(ক) জাতিসংঘ (খ) ইইউ

(গ) ইউএসএ (ঘ) বিশ্বব্যাংক

২। সুশাসনের ইস্যু বলতে বুঝায়-

(ক) সুবিধা (খ) প্রতিকূলতা

(গ) অপ্রযোজ্যতা (ঘ) অপরিহার্যতা

৩। সুশাসনের জন্য প্রয়োজন

i. জবাবদিহিতা

ii. দায়িত্বহীনতা

iii. স্বচ্ছতা বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) সবকটি

পাঠ-১০.২ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- টেকসই উন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা কি তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও সমস্যা উত্তরণে বাংলাদেশের সক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- টেকসই উন্নয়ন প্রস্তাবনা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	টেকসই উন্নয়ন, লক্ষ্যমাত্রা, সহসশ্রাব্দ উন্নয়ন, প্রস্তাবনা, খাদ্য নিরাপত্তা।

যে উন্নয়ন ভবিষ্যত প্রজন্মের উন্নয়ন চাহিদার কোন ধরণের ক্ষতি না করে বর্তমান উন্নয়ন চাহিদা পূরণ করতে পারে, সে ধরণের উন্নয়নকে টেকসই উন্নয়ন বলে। জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৮৭ সনে পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে টেকসই উন্নয়নে দুটি মূল ধারণার কথা বলা হয়েছে।

১. দরিদ্র শ্রেণির অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটানো।
২. পরিবেশ সুরক্ষায় যৌক্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার।

বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন বলতে এক কথায় সামাজিক সম্পৃক্তকরণ এবং পরিবেশ সম্মত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বুঝায়।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা :

টেকসই উন্নয়ন হল ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ক্ষমতা এবং বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে 'রূপান্তরিত আমাদের পৃথিবী: ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)' শিরোনামে প্রস্তাবনা গৃহীত হয়েছে। জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ২০১৬ সালের ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর তিনদিন ব্যাপী বিশ্ব সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সব লক্ষ্যমাত্রা অনুমোদিত হয়েছে। এসব লক্ষ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) কে প্রতিস্থাপন করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত। নিম্নে টেকসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা আলোচনা করা হল।

১। দারিদ্র বিমোচন : সর্বত্র এবং সবধরণের দারিদ্র দূরীকরণ।
২। ক্ষুধামুক্তি : ক্ষুধা দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, উন্নত পুষ্টি অর্জন এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা চালু করণ।
৩। সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ : স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন নিশ্চিতকরণ জাতি, ধর্ম ও বয়স নির্বিশেষে সকলের জন্য কল্যাণ বৃদ্ধি।
৪। মানসম্মত শিক্ষা : মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সকলের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ আইন।
৫। লিঙ্গ সমতা : লিঙ্গ সমতা অর্জন ও সকল নারী ও কন্যা শিশুর মর্যাদা নিশ্চিতকরণ।
৬। বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন : সবার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সুযোগ সৃষ্টি ও এর টেকসই ব্যবস্থাপনা।
৭। টেকসই জ্বালানি : সবার জন্য ব্যয় সাধ্য, নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সৃষ্টি ও এর টেকসই ব্যবস্থাপনা।
৮। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণকালীন ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং ভালো কাজের নিশ্চয়তা বিধান।
৯। শিল্প উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো : দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং টেকসই শিল্পায়ন ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা।
১০। বৈষম্য হ্রাসকরণ : দেশের অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যকার বৈষম্য দূর করা।
১১। টেকসই শহর : শহরে নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই বাসস্থান নির্মাণ করা।
১২। সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার : টেকসই ভোগ ও উৎপাদন নিশ্চিত করা।
১৩। জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ : জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রভাব মোকাবেলায় জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ।
১৪। সমুদ্রের সুরক্ষা : টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সাগর এবং সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার।

১৫। ভূমির সুরক্ষা : টেকসই বন ব্যবস্থাপনা,মরুকরণ রোধ করা, ভূমিক্ষয় রোধ এবং জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন বন্ধ করা।

১৬। শান্তি ও ন্যায়বিচার : টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সকলের জন্য ন্যায় বিচারের সুযোগ সৃজন।

১৭। লক্ষ্য অর্জনের জন্য অংশিদারিত্ব : টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈশ্বিক উন্নতি করা।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সক্ষমতা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ বিশ্বজুড়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করেছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। বাংলাদেশসহ ১৯৩টি দেশ পনেরো বছর মেয়াদি ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । ২০৩০ সালের মধ্যে শুধুমাত্র টেকসই বিশ্ব নয় বরং সমৃদ্ধি, সমতা ও সুবিচারের দিক থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বৈশ্বিক উন্নয়নের একটি নতুন এজেন্ডা।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পূর্বে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ হতে ২০০০ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) হাতে নেয়া হয়। ২০১৫ সালে শেষ হওয়া এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সফলতা বেশ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ এমডিজি'র যেসব খাতে সফল হয়েছে সেগুলো হল দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং লিঙ্গভিত্তিক সমতা। এই সফলতাকে ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন এসডিজির সফল বাস্তবায়ন। কেননা ২০১৬ থেকে ২০৩০ মেয়াদে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যের উদ্দেশ্য হলো : দারিদ্র দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টিমান উন্নয়ন, স্বাস্থ্যমান অর্জন, মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, নারীর সর্বজনীন ক্ষমতায়ন, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলাসহ সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। এসডিজির লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন যেমন আছে, তেমনি বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের স্থিতিশীলতা আনার কর্মসূচিও আছে। জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতি কমানো থেকে শুরু করে শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক সমাজ বিনির্মাণ করা কিংবা সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রভৃতি বিষয়সমুহ এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিবে। সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ের সহযোগিতা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রনীতব্য উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় সাধন করে এসডিজি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারলে বাংলাদেশ অবশ্যই সফল হবে।

প্রস্তাবনা :

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কিছু প্রস্তাবনা রয়েছে। নিম্নে আলোচনা করা হল:

১। সরকারি কর্মকর্তাদের পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দান ।

২। আধুনিক সতর্ককারী ব্যবস্থা চালু করে আবহাওয়াজণিত বিপর্যয় থেকে উপকূলীয় মানুষকে নিরাপত্তা দান।

৩। গণসচেতনতা তৈরি করতে সুশীল সমাজের উদ্যোগী ভূমিকা নিশ্চিত করা।

৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে কোর্স চালু করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। জলবায়ু সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৬। বিকল্প জ্বালানি ও প্রযুক্তি উৎপাদন এবং ব্যবহার করতে হবে।

৭। টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতীয় বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।

৮। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

৯। গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন করে এরূপ যানবাহন বন্ধ করার জন্য কর আরোপ করতে হবে।

১০। সৌরশক্তি, বায়ুকল এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	এসডিজি এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

সারা বিশ্বে টেকসই উন্নয়ন করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক ১৭টি লক্ষ্য (এসডিজি) নির্ধারিত হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রার মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে এসডিজি গৃহীত হয়েছে। এর লক্ষ্য ভবিষ্যৎ উন্নয়ন চাহিদার কোনরূপ ক্ষতি না করে বর্তমান উন্নয়ন চাহিদা পূরণ করা। এসব লক্ষ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)-কে প্রতিস্থাপিত করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এসডিজি কাদের প্রয়োজন মেটাবে?

(ক) উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠী (খ) বর্তমান ও ভবিষৎ জনগোষ্ঠী

(গ) বর্তমান জনগোষ্ঠী (ঘ) মধ্যবিত্ত

২। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হল এমন একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা, যার লক্ষ্য-

(ক) বৈশ্বিক উন্নয়ন সংক্রান্ত

(খ) বর্তমান উন্নয়ন সংক্রান্ত

(গ) মধ্য আয়ের দেশগুলির উন্নয়ন সংক্রান্ত

(ঘ) অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়ন সংক্রান্ত

৩। এসডিজির ১৫ বছর মেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা শেষ হবে-

(ক) ২০২৫ সালে (খ) ২০৩০ সালে

(গ) ২০৩২ সালে (ঘ) ২০৩১ সালে

পাঠ-১০.৩ সুশাসনে নারীর ক্ষমতায়নের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সুশাসনে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দুর্নীতি, জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা, ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার

যে কোন রাষ্ট্রের উন্নয়ন আর অগ্রযাত্রার মূল চাবিকাঠি সুশাসন। সুশাসন নিশ্চিত না হলে কোন রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হতে পারে না। সুশাসন বলতে সাধারণত কিছু নিয়মনীতিকে বুঝায় যেগুলো সরকারি সংগঠনসমূহের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, সুশাসন দুর্নীতি কমাতে সাহায্য করে। সমাজের বর্তমান এবং ভবিষ্যত চাহিদা পূরণের দায়বদ্ধতা শাসন ব্যবস্থার উপরই বর্তায়।

একটি রাষ্ট্রে সুশাসন তখনই নিশ্চিত হয় যখন সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত হয়। সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রবেশসহ ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। উভয়ের সহযোগিতায়ই অর্জিত হয় সুশাসন। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী তাই নারীদেরকে ব্যতিরেকে কোন শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা সম্ভব নয়।

নারীর ক্ষমতায়ন

বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়ের মধ্যে একটি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়নের মূল কথা হচ্ছে জেন্ডার বৈষম্যহীন এক পৃথিবী গড়ে তোলা। যেখানে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী তাঁর নিজের জীবনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। নারী ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারী বিদ্বেষী ক্ষমতার উৎস ও কাঠামোর পরিবর্তন, নারীর সুপ্ত প্রতিভা এবং সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ।

অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন তাঁর গবেষণায় তুলে ধরেছেন, দক্ষিণ এশিয়ার একাধিক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ের নারীরা অর্থনৈতিক দিক থেকে এগিয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন তখনই হবে যখন কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ থাকবে। সেটা ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ পর্যায়ে হতে পারে। একজন কর্মক্ষম নারী শ্রমের বিনিময়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলে পরিবার, সমাজ তাঁর সিদ্ধান্তের গুরুত্ব দেবে। তিনি সামাজিক কর্মকান্ডে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। এভাবেই নারীর উন্নয়নের মধ্য দিয়ে মানব উন্নয়ন সাধিত হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাতে (এসডিজি) নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে যেকোনো নীতি নির্ধারণে এখন নারীরা গুরুত্ব পাচ্ছে। স্থানীয় সরকার, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে নারীর উপস্থিতি ক্রমাগত বাড়ছে। তৈরি পোষাক শিল্পে কর্মরত সিংহভাগ শ্রমিক নারী। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশে মোট কর্মজীবীর মধ্যে ১ কোটি ৬২ লাখ নারী।

নানা ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি হলেও, নারীর প্রতি সামাজিক ও কাঠামোগত বৈষম্য ও বৈরিতার অবসান হয় নি। নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে বটে। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এখনও সক্ষমতা অর্জন হয় নি। এখনো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীর মতামত খুব বেশি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় না। পরিস্থিতির উন্নয়নে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাঠামোতে আরো পরিবর্তন আনতে হবে। বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা

প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক আইন সংযোজন করতে হবে। শুধু তাই নয়, বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগও ঘটাতে হবে। মোট কথা, নারীর ক্ষমতায়নে রাষ্ট্রকে আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বুঝায়?

সারসংক্ষেপ

সুশাসনের সাথে নারীর ক্ষমতায়ন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সুশাসনের একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে নারী ও পুরুষের সম অংশগ্রহণ। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা সক্ষমতার প্রমাণ দিয়ে চলেছে অবিরাম। কিন্তু নারী বিদ্বেষী শক্তিগুলোর কারণে এখনো বাংলাদেশের নারীদেরকে নানা রকমের বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপের জন্য রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ভূমিকা নিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা কত?

(ক) দেড় কোটির বেশি (খ) দুই কোটির বেশি

(গ) এক কোটির কম (ঘ) কোনটিই নয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর দিন

পপী বেগম একজন গৃহিণী। সংসারে কোন মতামত দেবার অধিকার তাঁর নেই। সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকে। অন্যদিকে সালমা বেগম গার্মেন্টসে কাজ করে। প্রতি মাসে সংসারের খরচ বাবদ তিনি স্বামীর হাতে টাকা তুলে দেন। স্বামী তাঁর সিদ্ধান্ত বা মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। কারণ তার স্ত্রী সংসারে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। অর্থনৈতিক অবদান রাখতে না পারায় সংসারে পপি বেগমের কোন মতামতই থাকছে না।

২। এর মূল কারণ হচ্ছে :

i. অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার অভাব

ii. রাজনৈতিক স্বাবলম্বিতার অভাব

iii. সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারের অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৪ দুর্নীতিঃ কারণ ও প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দুর্নীতি কি জানতে পারবেন।
- দুর্নীতির কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দুর্নীতি, মূল্যবোধ, কৌশল, আইন, প্রশাসন, সচেতনতা।

দুর্নীতি এক ধরনের সামাজিক ব্যাধি। যেসব সমস্যা আমাদের সমাজের সর্বত্র মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করে চলেছে তার মধ্যে দুর্নীতি অন্যতম। গোটা সমাজই আজ দুর্নীতি নামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত। গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজের একজন সাধারণ নাগরিকের সম্পর্কেও দুর্নীতির অভিযোগ শোনা যায়। দুর্নীতি অতীতেও ছিল। প্রাচীন ভারতের পন্ডিত কোটিল্য প্রায় দু'হাজার বছর আগে তাঁর অর্থশাস্ত্রে দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

দুর্নীতির ধারণা

দুর্নীতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা বেশ জটিল। কারণ সমাজভেদে এবং একই সমাজে যুগভেদে নীতি, আদেশ ও মূল্যবোধের পার্থক্য দেখা দেয়। দুর্নীতি যেহেতু নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থীমূলক কাজ, সেহেতু দুর্নীতিমূলক কাজের উদাহরণ দিতে গেলে স্থান-কাল-পাত্র-আদর্শ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হয়। সাধারণভাবে দুর্নীতি বলতে আইন ও নীতির বিরুদ্ধ কাজকে বুঝায়। দুর্নীতির সাথে পেশা, ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা, পদবি, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয় গভীরভাবে জড়িত।

দুর্নীতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল "Corruption" এই শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ "Corruptus" থেকে। এর অর্থ ধ্বংস বা ক্ষতিসাধন। দুর্নীতি সব সময়ই নেতিবাচক শব্দ। আভিধানিক অর্থে দুর্নীতি হল নীতির বিরুদ্ধে আচরণ।

'ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' মনে করে ''সমকালীন বিশ্বের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দুর্নীতি। জাতিসংঘ প্রণীত ম্যানুয়াল অপ অ্যান্টি-করাপশন পলিসিতে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারই হল দুর্নীতি।

বাংলাদেশের 'দুর্নীতি দমন কমিশন' এর একটি প্রকাশনাতে দুর্নীতি বলতে বোঝান হয়েছে, ''ব্যক্তি স্বার্থ অর্জনের বা ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারই দুর্নীতি।'' যেমন- রাষ্ট্রীয় সম্পদের অব্যবহার, সরকারি সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ে অস্বচ্ছতা, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, অসৎ উদ্দেশ্যে প্রভাব বিস্তার, ঘুষ গ্রহণ, অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার সবই দুর্নীতি।

এক কথায় স্ব-স্ব অবস্থান ও পেশার মাধ্যমে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে পরিচালিত আচরণই দুর্নীতি।

দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব

দুর্নীতি সমাজকে কলুষিত করে। দুর্নীতি জাতীয় সম্পদের বেআইনী বন্টন ও অপচয় ঘটায়। ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআইবি) ২০১৬ সালের প্রতিবেদন মোতাবেক, বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে ত্রয়োদশতম দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ। দুর্নীতির ফলে এক শ্রেণির মানুষ রাতারাতি সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে। ফলে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়। ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত ২০১৫ সালের এক জরিপে দেখা যায়, ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সমগ্র দেশে ৮৮২৮ কোটি টাকা ঘুষ দেনদেন হয়েছে, যা জিডিপির ০.৬%। দুর্নীতি সরকারি আইন-কানুনের ব্যতয় ঘটায়। নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে। রাষ্ট্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা বাধা গ্রস্থ হয় এবং ভবিষৎ প্রজন্ম বিভ্রান্ত ও বঞ্চিত হয়।

দুর্নীতির কারণ

নিম্নে দুর্নীতির কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হল :- (১) বেকারত্ব, (২) রাজনৈতিক প্রভাব (৩) পারিবারিক সংস্কৃতি (৪) আইনের দুর্বলতা (৫) দেশপ্রেম ও মূল্যবোধের অভাব (৬) অর্থনেতিক অসচ্ছলতা (৭) আমলাদের প্রভুসুলভ মানসিকতা (৮) নৈতিক শিক্ষার অভাব (৯) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি। উল্লেখিত কারণগুলো থেকে সৃষ্ট দুর্নীতির দ্বারা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায়

দুর্নীতি সুশাসনের অন্যতম অন্তরায়। দুর্নীতি সরকারি নীতিসমূহকে কলুষিত করে ও সম্পদের বে-আইনী বন্টন ঘটায়। দুর্নীতি প্রতিরোধে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, আইনের সংশোধন ও যথাযথ বাস্তবায়ন, মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত করা জরুরি। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ জরুরি। দুর্নীতিকে বর্জন করার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সৎ ও নির্দেশনামূলক পরামর্শ, সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের শিক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সর্বোপরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই সমাজ থেকে 'দুর্নীতি' নামক বিষয়টি দূরীভূত হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	দুর্নীতি কী? দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিরোধের তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি। বিশ্বের অধিকাংশ উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। দুর্নীতি হল, ব্যক্তি স্বার্থ অর্জনের বা ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য শক্তিশালী দুর্নীতি দমন কমিশন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা, সামাজিক সচেতনতা, দক্ষ ও নিরপেক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলা প্রয়োজন। তাহলেই সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারই দুর্নীতি'- এই সংজ্ঞা কোন সংস্থার?

(ক) মানবাধিকার কমিশন (খ) জাতিসংঘ

(গ) আন্তর্জাতিক আদালত (ঘ) দুদক

২। দুর্নীতি একটি সর্বগ্রাসী-

(ক) শারীরিক ব্যাধি (খ) মানসিক ব্যাধি

(গ) সামাজিক ব্যাধি (ঘ) চিন্তামূলক ব্যাধি

৩। দুর্নীতি শব্দটি এসেছে ?

(ক) ল্যাটিন শব্দ Corruptus থেকে

(খ) গ্রীক শব্দ Corruption থেকে

(গ) ইংরেজি শব্দ Damage অর্থ ধ্বংস বা ক্ষতিসাধন থেকে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বড় ভাইয়ের বিপুল প্রতিপত্তি দেখে ছোট ভাই মনোয়ার সব সময় হীনমন্যতায় ভোগে। মনোয়ারের স্ত্রী ও তার স্বামীর টাকা পয়সা না থাকার কারণে বড় ভাইয়ের সাথে তুলনা করে। বিপুল ধনসম্পদ থাকায় বড় ভাই সমাজে সকলের কাছে শ্রদ্ধাভাজন। মনোয়ার এসব দেখে মনে মনে ইর্ষান্বিত হয়। এক পর্যায়ে সে দুর্নীতির পথে পা বাড়ায়।

৪। উদ্দীপকে মনোয়ার কোন বিষয়টির দ্বারা দুর্নীতিতে প্রভাবিত হয়?

(ক) মানসিক হীনমন্যতা (খ) উচ্চভিলাষী জীবনের মোহ

(গ) সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি (ঘ) সব কয়টি

৫। উদ্দীপকের দুই ভাইয়ের ঘটনা দুর্নীতির বিস্তার ঘটায়

i) অসম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করায়

ii) অর্থকে প্রধান মানদন্ড বিবেচনা করায়

iii) সামাজিক মর্যাদা লাভের আশায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৫ জলবায়ু পরিবর্তন ও রাজনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জলবায়ু পরিবর্তন কী বলতে পারবেন।
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার রাজনীতি বুঝতে পারবেন।
- জলাবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় করণীয় আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বৈশ্বিক উষ্ণতা, গ্রীণ হাউজ গ্যাস, বৃক্ষ নিধন, শিল্পায়ন, নগরায়ন, নীতি ও কৌশল, ক্ষতিপূরণ, অভিযোজন, কনফারেন্স অব পার্টিস (কপ)

জলবায়ু একটি নির্দিষ্ট আয়তনের এলাকার দীর্ঘ দিনের আবহাওয়ার গড় অবস্থা। এর পরিবর্তন অতি দীর্ঘ ব্যবধানে হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু জলবায়ু অস্বাভাবিক ও দ্রুত পরিবর্তন আজ সমগ্র বিশ্বের চিন্তার বিষয়। বাংলাদেশেও জলবায়ুর পরিবর্তন খুব স্পষ্ট লক্ষ্যণীয়। বিশেষ করে অতি দীর্ঘতর এবং উষ্ণতর গ্রীষ্মকাল, দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তৃত এলাকায় সমুদ্রের লোনা পানির প্রবেশ খুব সহজেই দৃশ্যমান। এ পরিবর্তনের সাথে রাজনীতি অনাকাঙ্খিতভাবে জড়িত। বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থার গবেষণায় এটি প্রমাণিত যে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অতিরিক্ত উষ্ণায়নই দায়ী। আর এই উষ্ণায়ন তেরি হয় উন্নত দেশগুলোর অতি শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং ভোগবাদী ব্যবস্থাপনার কারণে। অর্থাৎ উন্নত দেশের ভোগ-বিলাসের বিপরীতে জান-মাল ও প্রাকৃতিক ঝুঁকিতে পড়ছে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলো। জলবায়ু পরিবর্তনের এই বৈপরীত্য মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন পড়ে রাজনৈতিক উদ্যোগ। তাই এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে জলাবায়ু পরিবর্তন ও রাজনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলো আলোচনা করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। নিচে জলবায়ু পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ আলোচনা করা হল -

গ্রীণ হাউজ গ্যাসঃ

পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী হল কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরিনেটেড গ্যাস। শিল্পায়ন, নগরায়ন এর ফলে অধিক পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানি, পেট্রোল, ডিজেল, অকটেন ইত্যাদি ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে। কিছু উপজাত হিসেবে নির্গত হচ্ছে অধিক তাপ ও গ্রীণ হাউস গ্যাস। এক্ষেত্রে কার্বন ডাই অক্সাইড সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর, যা একাই ৬৪% উষ্ণতা তৈরি করে। তাছাড়া মিথেন ১৭% এবং নাইট্রাস অক্সাইড ৬% উষ্ণায়ন করে থাকে। বৈষয়িক উষ্ণায়নে দায়ী কয়েকটি উন্নত দেশের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হল-
আমেরিকার পরিবেশ নিরাপত্তা সংস্থার হিসাব মতে ২০১১ সালে চীন ২৮%, আমেরিকা ১৬%, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ১০%, ভারত ৬%, রাশিয়া ৬% এবং জাপান ৪% গ্রীণ হাউজ গ্যাস নির্গমণ করেছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় বিশ্বের প্রায় ১০টি দেশ প্রায় ৭০ ভাগ গ্যাস নির্গমণ করে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের নির্গমণ মাত্র ০.৩%, অথচ ক্ষতিগ্রস্থ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম একেবারে উপরের দিকে।

নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন :

শিল্পায়ন, নগরায়ন সর্বোপরি জীবিকার তাগিদে বিশ্বের বনভূমি দিন-দিন হ্রাস পাচ্ছে। এক গবেষণায় দেখা যায়, বিশ্বে বছরে ১৩.৭ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি উজার হচ্ছে, যা প্রায় গ্রীস রাষ্ট্রের সমান। কিন্তু নতুন সৃষ্টি হচ্ছে মাত্র তার অর্ধেক। এ বিষয়েও চিত্র প্রায় উল্টো। যেসব দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে তাদের বনভূমি কম এবং তা দ্রুত কমছে। বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ ১০ ভাগেরও কম। বনভুমি হ্রাস পাওয়ায় পৃথিবীর তাপমাত্রা শোষিত না হয়ে বায়ুমন্ডলকে উষ্ণ করছে। তাছাড়া কৃষি আবাদ বৃদ্ধিতে বেশি পরিমাণে রাসায়নিক সার কীটনাশক ব্যবহার ও অতিরিক্ত গবাদি-পশু পালন জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার রাজনীতি :

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত সকল গবেষণাই এর জন্য উন্নত দেশগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে। অনুন্নত দেশগুলো যখন বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে তখন উন্নত দেশগুলো উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও ভোগ বিলাসে মত্ত। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দুই ধরনের রাজনীতি দেখা যায়-

আন্তরাষ্ট্রীয় :

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, রাষ্ট্র ও স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার উদ্যোগ গ্রহণ। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো সংগঠনগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থা নিয়মিত সম্মেলনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অংশীদারিত্ব তৈরি করছে। তথাপি অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো ন্যায্য ক্ষতিপূরুণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই রাজনৈতিক প্রচেষ্টা আরো জোরদারে ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন ফোরাম এ জোরালো অবস্থান তৈরি করছে। কিন্তু বিভিন্ন সম্মেলনে এ পর্যন্ত প্রতিশ্রত ক্ষতিপূরণের অর্থ দেশগুলো এখনও তেমনভাবে পায় নি। তাই বিশ্লেষকগণ মনে করেন প্রত্যেকটি রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে রাজনৈতিক ঐক্যের মাধ্যমে আরো চাপ সৃষ্টি করা উচিত।

অভ্যন্তরীণ :

জলবায়ু পরিবর্তনে উন্নত দেশগুলো দায়ী কিন্তু তাদের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়া অনেক সময় সাপেক্ষ ও শর্ত পূরণের বিষয়। তাই বাংলাদেশ সরকার স্ব-উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার পথ ধরে ইতোমধ্যে বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এজন্য দেশীয় সম্পদ ও প্রযুক্তিতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করা জন্য অধিকতর রাজনৈতিক ঐক্য ও উদ্যোগ জরুরি। বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি থাকার পরও, রাজনৈতিক দলগুলো জলবায়ু পরিবর্তনকে এখনো তাঁদের রাজনৈতিক ইস্যু করছে না বা পরিবেশাবাদী কোন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠছে না। কানাডা, জার্মানির মতো দেশগুলোতে পরিবেশবাদী রাজনৈতিক দল রয়েছে। এই দলগুলো এখন সরকারের উপর নানাবিধ চাপ সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআইবি) এর গবেষণায় দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তন এই তহবিলেও দুর্নীতি হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দুর্নীতি ও অবহেলা মোকাবেলা করার জন্যও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ জরুরি। সময়োপযোগী নীতি ও কৌশল প্রয়োগে রাজনৈতিক সদিচ্ছা অপরিহার্য।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় করণীয়

রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন যুক্ত করার কোন বিকল্প নেই। নিচে সরকার এবং রাজনৈতিক সংগঠনের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হল-

১. সরকারি নীতিমালায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা
২. সরকারি-বেসরকারি গবেষণা বৃদ্ধি করা
৩. পরিবেশবাদী রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি
৪. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়ে অভিজ্ঞ টিম গঠন। এ টিমের কার্যক্রম হবে ক্ষতিপূরণের যৌক্তিকতা নিরুপণে প্রকৃত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা এবং প্রয়োজনে লবিং/যোগাযোগ করা।

পরিশেষে বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী নয়। দায়ী রাষ্ট্রগুলো চেষ্টা করলেই পৃথিবীর তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে (২°c এর কম বৃদ্ধি) রাখতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবগুলো আলোচনা কর।

সারসংক্ষেপ

দ্রুত ও অস্বাভাবিক জলবায়ু পরিবর্তন সমগ্র পৃথিবীর জন্য হুমকিস্বরূপ। জীবাশ্ম জ্বালানির অধিকতর ব্যবহার, বনাঞ্চল ধ্বংস করা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ নানাবিধ কারণে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনে মানবসৃষ্ট কারণই দায়ী এবং তা করছে শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলো। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্ত:রাষ্ট্রীয় এবং অভ্যন্তরীণ উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য দায়ী

i. বৃক্ষরোপণ

ii. গ্রীণ হাউজ গ্যাস

iii. অতিরিক্ত গবাদিপশু পালন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) কোনটিই নয়

২। শিল্পোন্নত চীন বিশ্বের কতভাগ গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন করে?

(ক) ২০% (খ) ২২%

(গ) ২৫% (ঘ) ২৮%

৩। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কোনটি গুরুত্বপূর্ণ?

(ক) নীতি ও কৌশল প্রণয়ন

(খ) আন্তর্জাতিক ফোরামে নিজ দেশের অবস্থান তুলে ধরা

(গ) জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা

(ঘ) সব কয়টি

পাঠ-১০.৬ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও করণীয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে অবগত হবেন।
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জলবায়ু, গ্রীণ হাউজ, সমুদ্রের পানির উচ্চতা, সিডর, আইলা, বৈশ্বিক, চরম আবহাওয়া

কোন স্থানের কোনো নির্দিষ্ট সময়ের (অন্তত ১ সপ্তাহ) বায়ুর তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ু প্রবাহ, বায়চাপের মিলিত অবস্থাকে সে সময়ের আবহাওয়া বলে। পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে কোনো স্থানের তাপ, চাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি ২৫ থেকে ৩০ বছরের গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলা হয়। অর্থাৎ আবহাওয়ার দীর্ঘদিনের গড় অবস্থাই জলবায়ু।

জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, উষ্ণতা বাড়ছে পৃথিবীর। মানুষের নানা কর্মকান্ডে বায়ুমন্ডলে কার্বন অক্সাইড, মিথেন ক্লোরোফ্লোরো কার্বনসহ বিষাক্ত গ্যাসের নিঃসরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বায়ুমন্ডলের ক্রমবর্ধমান উত্তাপই বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ। জলবায়ু পরিবর্তনে বার বার বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলোচ্ছাস হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনে বাড়ছে ভূমিহ্রাস, ধ্বংস হচ্ছে পরিবেশ ও প্রতিবেশ। এসব কিছু মানবগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার উপর দারুন প্রভাব ফেলছে।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনে পৃথিবীর যে দেশগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বর্তমানে বাংলাদেশে যে সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে তার মূল কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। বিশেষজ্ঞদের মতে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ২০ শতাংশ এলাকা সমুদ্রে তলিয়ে যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে যে নানা রকম প্রভাব দেখা দিচ্ছে সেগুলি হল :-

১. অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ২০১০ খ্রিস্টাব্দে গড়ে বিগত পনের বছরের তুলনায় কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। কিন্তু সিলেট ও রাজশাহীতে বিগত দুই বছরের তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

২. ঘুর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি: ঘূর্ণিঝড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের ২০১০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়ের জন্য ঝুকিপূর্ণ ১২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ দ্বিতীয়।

৩. মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি: মাটিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০ সালে লবণাক্ত ভূমির পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ হেক্টর , ২০০১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ লক্ষ হেক্টরে ।

৪. গাছপালা ও প্রাণী ধ্বংস: বাংলাদেশের বনাঞ্চল ক্রম হ্রাসমান। বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বনভূমির পরিমাণ ১১%, যেখানে একটি দেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ ন্যূনতম ২৫% হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫. সুপেয় পানির সংকট: দেশের অধিকাংশ নদীর পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার কারণে অনেক সাধারণ নলকূপ অকেজো হয়ে পড়েছে।

৬. জীব বৈচিত্র ধ্বংস: বনাঞ্চলের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ফলে জীব বৈচিত্র হারিয়ে যাচ্ছে। গত একশ বছরে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৩১ প্রজাতির বন্য প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

৭. মরুকরণ: গড় বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ার ফলে খরার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় করণীয়

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এবং যে কোন দেশের অভ্যন্তরে করণীয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. শিল্প উন্নত দেশগুলোতে গ্রীণ হাউজ গ্যাস নি:সরণ আরো কমিয়ে আনতে হবে।
২. পরিবেশ দুষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
৩. জলবায়ুর প্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করে, যথোপযুক্ত সচেতনতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
৪. জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।
৫. প্রাকৃতিক শক্তি (যেমনঃ প্রবাহবান বায়ু, পানি শক্তি এবং সৌর শক্তি)-এর ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সরকারের করণীয়ঃ

১. সরকারি নীতিমালায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিভিন্ন নীতি সংযোজন করতে হবে ।
২. সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে আলোচনা করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় করণীয় স্থির করতে হবে।
৩. পরিবেশ বিরোধী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪. জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিপূরণ আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

এছাড়া, নদী ড্রেসিং করে নাব্যতা বৃদ্ধি, নদী ভাঙ্গন রোধ, কীটনাশক ব্যবহার নিষিদ্ধ, গ্রীণ হাউজ গ্যাস উৎসারণ কমানোসহ আনুষঙ্গিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিলে জলবায়ুর প্রভাব থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত হওয়া যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ চিহ্নিত করে প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করুন।

সারসংক্ষেপ

সমগ্র পৃথিবীর মত বাংলাদেশেও জলবায়ু পরিবর্তন একটি বড় সমস্যা। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে দায়ী না হয়েও সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে লবণাক্ত পানি কৃষি জমিতে প্রবেশ থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি এখন বাস্তবতা। তাই এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুপরিকল্পিত ও সমন্বিত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কত সালের মধ্যে বাংলাদেশের ২০ শতাংশ ভূমি সমুদ্রে তলিয়ে যেতে পারে?
(ক) ২০৫০ (খ) ২০৬০
(গ) ২০৭০ (ঘ) ২০৮০

২। কোনটি ঠিক?
(ক) জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক বাস্তবতা (খ) জলবায়ু পরিবর্তনের দেশিয় বাস্তবতা
(গ) জলবায়ু পরিবর্তনের আঞ্চলিক বাস্তবতা (ঘ) কোনটি নয়

৩। বাংলাদেশ থেকে ইতোমধ্যে কত প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে?
(ক) ৩০ (খ) ৩১
(গ) ৩২ (ঘ) ৩৩

পাঠ-১০.৭ খাদ্যে ভেজাল ও আমাদের করণীয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- খাদ্যে ভেজাল কী বলতে পারবেন।
- খাদ্যে ভেজালের কারণ আলোচনা করতে পারবেন।
- খাদ্যে ভেজাল রোধে আমাদের করণীয় কী তা জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ফরমালিন, ইউরিয়া, কীটনাশক, কার্বাইড, আইনী কাঠামো, মান নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ

প্রতিটি মানুষেরই বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। আবার ভেজাল খাদ্য গ্রহণ জীবন নাশ করে। বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এই কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট। এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও আমলাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় ও উদাসীনতার সুযোগে তারা এই ঘৃণিত কাজ করে যাচ্ছে। যখন কোন সঠিক খাবার বা উৎকৃষ্ট খাবারের সঙ্গে খারাপ খাবার বা নিকৃষ্ট খাবার মেশানো হয় তাকে খাদ্যে ভেজাল বলে। যে খাবার মানসম্মত নয়, স্বাস্থ্যকর নয়, বরং স্বাস্থ্যের জন্য অধিক ক্ষতিকর সেটাই 'ভেজাল খাদ্য'। সুস্থ জীবন আর রোগমুক্ত জীবনের নিশ্চয়তার জন্য ভেজাল প্রতিরোধে সকল মানুষেরই সোচ্চার হতে হবে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

"ভেজাল" একটি আইনি শব্দ, যার অর্থ মিশ্রিত, মেকী বা খাঁটি নয় এমন। উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সাথে নিকৃষ্ট দ্রব্যের মিশ্রণকে ভেজাল বলে। অন্য কথায় খাদ্যের পরিমাণ, স্থায়ীত্ব অথবা স্বাদ বৃদ্ধির জন্য কাঁচা বা প্রস্তুতকৃত খাদ্য সামগ্রীতে এক বা একাধিক ভিন্ন পদার্থ সংযোজন। নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ আলোকে " বিভিন্ন উপায়ে খাদ্যে পরিবর্তন সাধন করে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, আইনের অধীন নিষিদ্ধ, খাদ্য দ্রব্যের ক্ষতি হয়েছে, গুণাগুন বা পুষ্টিমান হ্রাস পেয়েছে, খাদ্য ক্রেতার আর্থিক বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়েছে" এমন খাদ্যই ভেজাল খাদ্য। খাদ্যে ভেজাল দেয়ার জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদন্ড ও ২০ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

খাদ্যে ভেজালের সাম্প্রতিক চাল চিত্র ও ধরণ

বাংলাদেশ চাল, ডাল, আটা, ময়দা, সুজি, তেল-মসলা, মাছ-মাংস সব কিছুতে ভেজাল দেয়া হচ্ছে। মাছে ও খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন, চালে পাথর কুচি, বালি, চালের রং উজ্জ্বল করার জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক ইউরিয়া মেশানো হচ্ছে। ফলে মানুষের কিডনি, লিভার, চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যাচ্ছে, ক্যান্সারসহ ভয়াবহ রোগের প্রবণতা বাড়ছে।

খাদ্যে ভেজালের কারণ

খাদ্যে ভেজাল এখন মানব জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ। ভেজালের প্রবণতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল মহামারি আকার ধারণ করেছে। খাদ্যে ভেজাল এর জন্য নিম্নরূপ কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে-

১. অধিক মুনাফা লাভের আশা
২. তদারকির অভাব
৩. আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া
৪. নৈতিকতার অভাব
৫. খাদ্য পরিবহণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থার অভাব
৬. ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ

খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ

খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। কাজেই যেকোনো মূল্যে ভেজালের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হবে। খাদ্যে ভেজালের প্রতিকার ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হল:-

১. **আইনী কাঠামো ও প্রয়োগ:** খাদ্য ভেজাল রোধের জন্য যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন অথবা প্রচলিত আইনের সংশোধন করতে হবে। বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ ১৯৫৯. (সংশোধিত ২০১৫), নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও মিডিয়ায় প্রচারণা চালাতে হবে।

২. **পণ্যের আন্তর্জাতিক মান নির্ণয়:** প্রচলিত মানদন্ড ও নিবন্ধীকরণ প্রক্রিয়া সংশোধন করতে হবে। মানব স্বাস্থ্যের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত পণ্য আইএসও (ISO) কর্তৃক যাচাই করতে হবে।

৩. **খাদ্য নিরাপত্তা বলয় গঠন :** প্রতিবেশী বা আঞ্চলিক দেশ সমূহের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত, সরবরাহ, বিনিময় ও মান নির্ণয়ে নিরাপত্তা বলয় গঠন করতে হবে। প্রয়োজনে WFO, ISO, WHO এর মত আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

৪. **সুশীল সমাজের দায়বদ্ধতা:** খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভোক্তা সমিতি, বিভিন্ন বণিক সমিতি ও পরিবেশবাদী সংগঠনকে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৫. **কারিগারি দক্ষতা ও অবকাঠামো বৃদ্ধি :** বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ ইন্সটিটিউট (BSTI), ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (TCB), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে আরও শক্তিশালী করে সম্প্রসারিত করা উচিত।

খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে একটি যুগোপযোগী নিয়ন্ত্রক সংস্থা একান্ত জরুরি। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা মুক্ত হতে হবে। সর্বোপরি দেশের জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। আইনের প্রয়োগ এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের করণীয়গুলো আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

খাদ্যে ভেজাল বাংলাদেশে সবচেয়ে আলোচিত একটি বিষয়। এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। যারা খাদ্যে ভেজাল মিশ্রিত করে তারা সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষের শত্রু। যারা এই অপরাধের সাথে জড়িত থাকে বা জড়িত হয় তারা জঘন্য অপরাধী। খাদ্যে ভেজাল রোধে বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ, অপরাধের শাস্তি নিশ্চিতকরণ ও নিয়মিত বাজার পরিদর্শন প্রয়োজন। এছাড়াও খাদ্যে ভেজাল রোধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অসাধু ব্যবসায়ী কেন খাদ্যে ভেজাল দিয়ে থাকে?

(ক) মানসিক রোগের জন্য (খ) অধিক মুনাফা লাভের জন্য

(গ) আইন না থাকার কারণে (ঘ) সামাজিক সমর্থন থাকায়

২। 'নিরাপদ খাদ্য আইন', কত সালে প্রণীত হয়েছে?

(ক) ২০১১ (খ) ২০১২ (গ) ২০১৩ (ঘ) ২০১৪

পাঠ-১০.৮ পরিবেশ দূষণ ও সুশাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পরিবেশ দূষণ কি ও এর কারণ বলতে পারবেন।
- পরিবেশ দূষণ এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পরিবেশ দূষণের প্রভাব সম্পর্কে অবগত হবেন।
- পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জৈবিক, অজৈবিক, পরিবেশ দুষণ, পানি দূষণ, গ্রীণ হাউজ, ভূগর্ভস্থ আর্সেনিক।

বর্তমান বিশ্বে যে সমস্ত সমস্যাগুলি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তার মধ্যে পরিবেশ দুষণ অন্যতম। সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোন ক্ষতিকর পদার্থের আধিক্যের কারণে পরিবেশের মধ্যে যদি কোন ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয় তখন তাকে পরিবেশ দুষণ বলে। পরিবেশ দুষণ বলতে, পরিবেশের মধ্যে মানুষ বা অন্য প্রাণীর স্বাভাবিক জীবনাচারণের জন্য ক্ষতিকর বস্তুর প্রবেশ ও বৃদ্ধি বোঝায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর মতে, ''পরিবেশে স্বাভাবিক অবস্থায় যে উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকে তাদের একটি, দুটি বা সবগুলোর পরিমাণ বা ঘনত্ব যখন বেড়ে যায় তখন তাকে পরিবেশ দূষণ বলে''।

ম্যাচাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে বিশদ সংজ্ঞা দিয়েছে। সংস্থাটির মতে ''দ্রব্য বা পরিসেবা উৎপাদন ও ভোগের যে কোনো পর্যায়ে যেসব বর্জ্য বা অবশিষ্ট পদার্থ সৃষ্টি হয় সেগুলি যখন বায়ুমন্ডলে, সমুদ্রে বা পার্থিব পরিবেশের কোথাও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তখন তাকে পরিবেশ দুষণ বলে"।

সাধারণভাবে পরিবেশ দুষিত হলে পানি, বায়ু, মাটি, শব্দ অর্থাৎ প্রাকৃতিক সকল উপাদানই দূষিত হয়।

পরিবেশ দূষণের কারণ

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট এই দুইভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটে থাকে। প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত অন্যতম। তবে বর্তমানে মানবসৃষ্ট কারণই পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ।

অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশ দূষণের উল্লেখযোগ্য কারণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ জল, মাটি, বায়ুর ওপর প্রচন্ড চাপ পড়ে। শুরু হয় বন সম্পদ বিনষ্টের মহড়া। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণী জগৎ। বর্তমানে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য এক সংকটজনক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধমান হারে শক্তি উৎপাদনের চাহিদা। শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে নির্গত হয় মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ-দূষক নানা রাসায়নিক দ্রব্য। দূষিত রাসায়নিক দ্রব্যই নানা দুরারোগ্য ব্যাধির দ্রুত প্রসারণের কারণ। এতে বায়ু-জল-খাদ্য দ্রব্য মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। বর্ধিত জনসংখ্যার জীবন ও জীবিকার তাগিদে শিল্পায়ন দ্রুততর হচ্ছে,পরিকল্পিত উপায়ে না হওয়ার ফলে তা প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে, দূষিত পরিবেশ হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে সমগ্র পৃথিবীকে।

পরিবেশ দুষণ ও সুশাসন

পরিবেশ দূষণের ফলাফল সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে। পরিবেশ দূষণের ফলে কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরপাত্তা, স্বাস্থ্য, আবাসনসহ নানাবিধ বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। যেমন ২০১১ সালে জাপানে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিস্তৃত এলাকায় পরিবেশ দূষণ করে এবং নির্দিষ্ট এলাকায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। পরিবেশ দূষণে মারাত্মকভাবে স্বাস্থ্য ঝুকি তৈরি হয়। বাংলাদেশের শিল্পাঞ্চলের নদী-নালা, জলাশয়গুলো চরম মাত্রায় দূষিত। বিশেষ করে ঢাকাসহ অন্যান্য বড় শহরের পার্শ্ববর্তী নদীর পানি দূষিত হয়ে এলাকার জন-জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। প্রায়শই নানাবিধ

চর্মরোগ ও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভূগছে মানুষ। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় রাষ্ট্র কর্তৃক মানব উন্নয়নে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হয়। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার গতি ধীর করে দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিবেশ বিপর্যয় বাংলাদেশের উপকূলীয় আঞ্চলের জনগণের জীবন-জীবিকা ও আবাসস্থল বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এ ধরণের প্রায় ২ কোটি জনগণের জীবিকা, খাদ্য নিরাপত্তা, আবাসন সমস্যা সমাধান যেকোন শাসনের জন্য চ্যালেঞ্জস্বরূপ।

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের উপায়

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতা কমিয়ে আনা এবং পরিবেশ দূষণ রোধে পদক্ষেপ গৃহিত হচ্ছে। এটি আজ বিশ্ব আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়-

(১) আইনগত কাঠামো শক্তিশালী করা এবং এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
(২) জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং পরিকল্পিত নগরায়ন।
(৩) জনসচেতনতা সৃষ্টি করা
(৪) বিকল্প জ্বালানি ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও প্রয়োগ
(৫) ব্যাপক হারে বৃক্ষ রোপন ও বন সংরক্ষণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরিবেশ দূষণের প্রভাব আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বর্তমান বিশ্বে যে কয়টি সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তার মধ্যে পরিবেশ দূষণ অন্যতম। স্বাভাবিকভাবে বলা যায়, ক্ষতিকর পদার্থের আধিক্যের কারণে পরিবেশের মধ্যে যদি কোন ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়, তখন তাকে পরিবেশ দূষণ বলে। আর এর প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার। সর্বোপরি এ সংক্রান্ত আইন মেনে চলা উচিত। পরিবেশের অতিদূষণ যেমন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে তেমনি সুশাসন নিশ্চিত করে পরিবেশ দূষণ অনেকাংশে প্রতিরোধ সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "পরিবেশে স্বাভাবিক অবস্থায় যে উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকে, তাদের একটি, দুটি বা সবগুলোর পরিমাণ বা ঘনত্ব যখন বেড়ে যায় তখন তাকে পরিবেশ দূষণ বলে"- উক্তিটি কার?

(ক) EU (খ) WHO
(গ) UNESCO (ঘ) FAO

২। পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী-

i. অপরিকল্পিত শিল্পায়ন
ii. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
iii. বনাঞ্চল ধ্বংস

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) সবকটি।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।
নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান করিম সরকারের প্রশাসনিক বিভাগে চাকরি পেয়ে রাতারাতি বদলে যায়। বড়লোক বন্ধুদের সাথে পাল্লা দিয়ে অল্প সময়েই বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়ে যায়। তার এ অবস্থা দেখে সমাজের অনেকেই তাকে নিয়ে সমালোচনা করতে শুরু করে।

(ক) খাদ্যে ভেজাল কি ধরণের অপরাধ?
(খ) খাদ্যে ভেজালের ধারণা ব্যাখ্যা কর?
(গ) উদ্দীপকের করিমের কর্মকান্ডে দূর্নীতির কোন কারণটিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) উক্ত কারণই দূর্নীতির একমাত্র কারণ নয়-বিশ্লেষণ করুন।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।
জনাব ফরহাদ ফলের ব্যবসায়ী। তিনি অধিক মুনাফার লোভে দোকানের বিভিন্ন প্রকার ফলে কার্বাইড ও ফরমালিন দিয়ে থাকেন। তিনি মনে করেন, এ ধরনের কাজ খারাপ নয়। তিনি অবগত নন যে, কাজটি অনৈতিক ও প্রতিনিয়ত ভোক্তা অধিকার হরণ করছেন। যা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

(ক) জলবায়ু পরিবর্তন কি?
(খ) গ্রীণ হাউজ গ্যাস বলতে কি বোঝায়?
(গ) উদ্দীপকে কোন নাগরিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা দিন।
(ঘ) উক্ত নাগরিক সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ উপস্থাপন করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২ ঃ ১। খ ২। ক ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩ ঃ ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪ ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৫ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৬ ঃ ১। ক ২। ক ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৭ ঃ ১। খ, ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৮ ঃ ১। খ ২। ঘ